শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকটের স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন

ড. আলা উদ্দিন

প্রকাশিত: ২১:১০, ১০ আগস্ট ২০২৪

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সংকট

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সংকট নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে প্রচুর আলোচনা ও কথাবার্তা চলে; কিন্তু এর কোনো গতি হয় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ শিক্ষাধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণ প্রায়ই তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন।

এর কারণ অধিকাংশ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তি বা তাদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। অধিকাংশ সময় তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফসল। তাই হঠাৎ হঠাৎ গৃহীত পরিবর্তন অধিকাংশ সময় শিক্ষাবান্ধব হয় না। চূড়ান্ত পরিণামে যা শিক্ষার গুণগতমান বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠন করা হয় (১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই)। তবে এ কমিশন প্রণীত প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ (১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত) বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

এর পরিবর্তে বরং আগেকার ধারায় আমলা-উৎপাদনমুখী চাকরিবান্ধব শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অদ্‌ভুত; কিন্তু 'জনপ্রিয়' অসদুপায় অবলম্বন হিসেবে এই সময়ে বিশেষ মাত্রা পায়।

১৯৯১-এ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বেসরকারি, বাণিজ্যনির্ভর ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা সমধিক অগ্রাধিকার পায়।

অদ্যাবধি যা অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এ+, জিপিএ ফাইভ ও নানা নামকরণ তথা 'ভালো' ফলের প্রতিযোগিতা। আগে যেখানে ভালো ঀ শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো, এখন তা অনেকাংশে ফলকেন্দ্রিক। 'ভালো' ফলকেন্দ্রিক ঀ শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ১৯৯১-এরপর পর। ১৯৯২ সাল থেকে প্রথমবারের মতো এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের ১০০ মার্কের স্থলে ৫০ মার্কের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নব্যাংক (৫০০ প্রশ্ন) প্রচলন শুরু হয় (গণিত ব্যতীত), যা অনেক সমালোচনামুখর ছিল। কারণ, এই প্রশ্নব্যাংক আদতে ঀ শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন অপেক্ষা মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করে।

পাঁচ বছর আগেও শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি নম্বর প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কথাও জানা যায়, যা অতীতে কখনো ঘটেনি; অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছেঁ পাঠদানের মাধ্যমে নয়, নম্বর প্রদানের মাধ্যমে। ফলে এক যুগ আগেও যেখানে কোনো গ্রামে চার-পাঁচজনের বেশি প্রথম বিভাগ কিংবা আট-নয়জনের বেশি এ+ পেত না, এখন যতজন পরীক্ষার্থী তার অর্ধেকের বেশি এ প্লাস বা জিপিএ ফাইভ পায়। অথচ প্রতিযোগিতামূলক কোনো পরীক্ষায় তাদের ফল খুব হতাশাজনক। স্কুল অপেক্ষা মাদরাসা এবং গ্রাম অপেক্ষা শহরের দিকে পাস ও 'ভালো' ফলের হার বেশি।

এর মধ্যে একটা অংশ এইচএসসি পাস করার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। কিন্তু ক্লাসে তাদের বেশিরভাগের পারফরমেন্স দেখে সংশয় জাগে, এরা তো অন্তত এসএসসি পাস করেছিল! তাদের অনেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও হচ্ছে। এ অবস্থায় আবার কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক করার জন্য দরকার হলে শিক্ষক নিয়োগের বিদ্যমান নীতিমালার বদল কিংবা স্থগিতও করা হয় (এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগণ্য)।

আর যারা শিক্ষক হতে পারে না তাদের বেশিরভাগের মূল আকর্ষণ বিসিএস পরীক্ষা পাস করে প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা তথা সরকারি ক্যাডার হওয়া। এই ধারা সাম্প্রতিক। প্রথম

শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা হতে পারা (বিশেষ করে প্রশাসন ও পুলিশ) মানে যেন বিশ্ব জয় করা। আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। আজ থেকে এক যুগ আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক পাওয়া যেত, যারা কি না সরকারি চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। বর্তমানে ঘটছে তার উল্টো।

একদিকে আর্থিক, প্রশাসনিক (ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা), অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি বিবেচনা তথা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয় অনেক বেশি।
বাণিজ্য ও প্রশাসননির্ভরতার কারণে ধীরে ধীরে সরকার আমলানির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে শিক্ষকদের পূর্বে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও আমলাদের অবস্থান সম্মুখ সারিতে। এই যদি হয় উচ্চশিক্ষার অবস্থা সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের অবস্থা কল্পনাতীত শোচনীয়। কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতির গতি অত্যন্ত শ্লথ। আর মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের শিক্ষকদের অবস্থা না হয় না-ই বললাম।

এই যদি হয় শিক্ষকদের অবস্থা তাহলে এই মানুষ গড়ার কারিগরদের কিইবা ক্ষমতা সত্যিকারের সুনাগরিক গড়ার! শিক্ষকদের কান ধরানো, পানিতে ডুবানো, লাঞ্ছনা করাসহ নানা ঘটনার কথা জেনে কেবল লজ্জিত হতে হয়। এই অপমানজনক অবস্থা থেকে শিক্ষকদের বুঝি মুক্তি নেই। অবশ্য শিক্ষকদের মাঝেও কিছুসংখ্যক রয়েছেন যারা অপরাজনীতিসহ নানা রকমের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তারাও শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের

সম্মান বিনষ্টের জন্য দায়ী।

শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকের সংখ্যা ইত্যাদি রীতিমতো বৈষম্যের রূপ ধারণ করেছে। আর একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে নানামুখী জগাখিচুড়িময় শিক্ষার ধারায় এর থেকে বেশি কিছু আশা করাও কঠিন। শহর-গ্রামের অব্যাহত বৈষম্যের কারণে দেখা যায় শহরের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করে।

কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্তরে এসে তারা সেই ধারা আর ধরে রাখতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বরং গ্রামের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সচিবালয়ে গ্রামে এসএসসি পাস করা শিক্ষক/সচিবের সংখ্যা বেশি। কিন্তু এই বিবেচনায় বিদ্যমান অবস্থা বা বৈষম্য অব্যাহত রাখলে তা রীতিমতো বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এত রক্তের বিনিময়ে পরিবর্তিত বাংলাদেশে তো নয়ই।

প্রশ্ন ফাঁস আরেকটি বড় ধরনের সমস্যা। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিসিএস, মেডিক্যালসহ প্রায় সকল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস না হওয়া (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে ব্যতিক্রম) এখন রীতিমতো অবাক করা খবর। হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকায় প্রশ্ন বিক্রির কথা শোনা যায়, যা অমূলক নয়। আগে কেবল চাকরির জন্য আর্থিক লেনদেনের কথা শোনা গেলেও এখন প্রশ্নপত্র, চাকরি, এবং বদলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে শিক্ষা নিয়ে, পরিকল্পনার অভাব নেই, অথচ বাজেট কমেছে। গুরুত্ব হারাচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা ও অনুকূল-নিরাপদ ক্যাম্পাস। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্ব হারাচ্ছে। কারণ, পাস করে বেকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এত এতো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়! শিক্ষার আরেকটি সংকট হলো শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তা।

ছাত্র রাজনীতি এবং যৌন সহিংসতা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে নিরাপদবোধ করে না। কিছুদিন পরপর সংঘর্ষ, হতাহত হওয়ার ঘটনা, নৃশংস হত্যাকা- এবং যৌন সহিংসতার খবর ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু যথাযথ বিচারের নজির কম, তাই যারা সংঘাত ও সহিংসতার শিকার তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে খুব অসহায়বোধ করে।

এরশাদের সামরিক আমলে শুরু হওয়া সেশন জটের কথা বলাই বাহুল্য। এটি আজও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেটি দূর করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করলেও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার জায়গাটা দুর্বল বিধায় সেশনজটমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিদ্যমান দুরাবস্থার সঙ্গে সাম্প্রতিক সময় সংযুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাস মহামারি।

তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির অবসান ঘটলেও এর রেশ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মুক্ত হতে পারবে কি না সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশের মাঝে, বিশেষ করে যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী প্রবণতাও লক্ষণীয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাবিধ বিদ্যমান সংকট প্রতিভাত।

বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মূলধারা-মাদরাসা শিক্ষার মাঝে অব্যাহত ব্যবধান বা বৈষম্য সৃষ্টি হয়, কর্মসংস্থান ও ব্যক্তি উদ্যোগ অপেক্ষা বেকারত্ব সৃষ্টি হয় (মোট জনশক্তির প্রায় ৫ শতাংশ, যা উচ্চ শিক্ষিতদের মাঝে বেশি), শিক্ষিতদের নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, গ্রামের শিক্ষিতরা গ্রাম বা শিকড়হীন হয়ে যায়, দেশ সেবার মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আশু সংস্কার আবশ্যক। তাছাড়াও লাখ লাখ মাদরাসা ছাত্রকে মূলধারার সমাজ ও উন্নয়নমূলক কর্মকা- থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে যৌন সহিংসতার ভয়ে সন্ত্রস্ত রেখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কিংবা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, বিদ্যমান সংকটসমূহ নিরসনকল্পে নিত্যপরিবর্তনশীল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করত বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।

লেখক : অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
alactg@gmail.com